অষ্টম অধ্যায়
বাংলাদেশের স্থানীয় সরকারব্যবস্থা

রাষ্ট্রের শাসনব্যবস্থার সুষ্ঠু পরিচালনার জন্য কেন্দ্রীয় প্রশাসনের পাশাপাশি স্থানীয় শাসনব্যবস্থা গড়ে উঠে। স্থানীয় পর্যায়ের সমস্যা সমাধানের জন্য তৃণমূল পর্যায়ে এই ধরনের সরকার গড়ে উঠে। বাংলাদেশে এই ধরনের স্থানীয় সরকারব্যবস্থা বিদ্যমান। স্থানীয় সরকারব্যবস্থায় জনগণ রাষ্ট্রের শাসনকার্যে প্রত্যক্ষভাবে অংশগ্রহণের সুযোগ পায়। তাই স্থানীয় শাসন গণতান্ত্রিক সরকারব্যবস্থার অপরিহার্য অংশ। এ অধ্যায়ে আমরা স্থানীয় সরকারব্যবস্থার গঠন, ক্ষমতা ও কাজ সম্পর্কে জানব।

এ অধ্যায় পাঠের মাধ্যমে আমরা–

- বাংলাদেশের স্থানীয় সরকারব্যবস্থার গঠন, ক্ষমতা ও কার্যাবলি বর্ণনা করতে পারব।
- বাংলাদেশের স্থানীয় সরকারব্যবস্থার বিভিন্ন স্তরের পারস্পরিক সম্পর্ক বিশ্লেষণ করতে পারব।
- নাগরিকতার বিকাশে স্থানীয় সরকারের গুরুত্ব বিশ্লেষণ করতে পারব।
- নাগরিক সুযোগ-সুবিধা প্রদানের ক্ষেত্রে স্থানীয় সরকারের গুরুত্ব বর্ণনা করতে পারব।

স্থানীয় সরকার

স্থানীয় সরকার হচ্ছে সমগ্র রাষ্ট্রকে বিভিন্ন অঞ্চলে বিভক্ত করে ক্ষুদ্রতর পরিসরে প্রতিষ্ঠিত সরকারব্যবস্থা। কেন্দ্রীয় সরকারের সাথে সম্পর্কের ভিত্তিতে স্থানীয় সরকারের রূপ দুই ধরনের হয়। যেমন : ১। স্থানীয় সরকার ও ২। স্থানীয় স্বায়ত্ত্বশাসিত সরকার। স্থানীয় প্রশাসন হচ্ছে সেই প্রশাসন যেখানে প্রশাসক সরাসরি কেন্দ্রীয় সরকার নিয়োগ দেয় এবং কেন্দ্রীয় সরকারের নির্দেশ বাস্তবায়নই এর প্রধান কাজ। বিভাগ, জেলা, উপজেলা পর্যায়ে প্রশাসনিক কর্মকর্তা এবং ইউনিয়ন পর্যায়ে সচিব সরকার কর্তৃক নিযুক্ত হন। স্থানীয় স্বায়ত্তশাসিত সরকার বলতে বুঝায় এমন ধরনের সরকারব্যবস্থা যা ছোট ছোট এলাকায় স্থানীয় প্রয়োজন মেটাবার জন্য জনগণের নির্বাচিত প্রতিনিধিদের দ্বারা গঠিত ও আইনের মাধ্যমে ক্ষমতাপ্রাপ্ত সংস্থা। আমাদের দেশে ইউনিয়ন পরিষদ, জেলা পরিষদ, উপজেলা, পৌরসভা ও সিটি কর্পোরেশন স্থানীয় স্বায়ত্তশাসিত সরকারের উদাহরণ। স্থানীয় প্রশাসন আবার স্থানীয় স্বায়ত্তশাসিত সরকারের সহযোগী হিসাবে কাজ করে।

স্থানীয় সরকারের গুরুত্ব

ব্রিটিশ রাজনৈতিক দার্শনিক জন স্টুয়ার্ট মিলের মতে, স্থানীয় সরকার সরকারি ও রাজনৈতিক কর্মকাণ্ডে জনগণের অংশগ্রহণের সুযোগ সৃষ্টি করে এবং এ বিষয়ে নাগরিকদেরকে সচেতন করে। স্থানীয় সরকার স্থানীয় পর্যায়ে নাগরিকদেরকে যথাযথভাবে বিভিন্ন সেবা প্রদান করতে পারে। কেন্দ্রীয় প্রশাসকদের পক্ষে সঠিক ভাবে স্থানীয় জনগনের স্বার্থ রক্ষা, তাদের সমস্যা সমাধান করা এবং স্থানীয় উন্নয়ন সংক্রান্ত বিষয়ে স্পষ্ট ধারনা অর্জন করা সম্ভব হয় না। এ ক্ষেত্রে তাদেরকে স্থানীয় সরকারের উপর নির্ভর করতে হয়। স্থানীয় সরকার এ সকল বিষয়ে তথ্য সরবরাহের মাধ্যমে কেন্দ্রীয় সরকারকে যথাযথ নীতিমালা গ্রহণ ও উন্নয়ন কর্মকান্ড বাস্তবায়নে সহায়তা করে।

বাংলাদেশের স্থানীয় সরকারব্যবস্থার স্বরূপ

বাংলাদেশের স্থানীয় সরকারব্যবস্থার দীর্ঘ ইতিহাস রয়েছে। মুঘল আমল থেকে শুরু হয়ে ব্রিটিশ শাসন পর্যন্ত নানা আইনি সংস্কারের মধ্য দিয়ে এদেশে স্থানীয় সরকারের শাসন-কাঠামো রূপ লাভ করে। পাকিস্তানি শাসন আমলে এর প্রকৃতি অপরিবর্তিত থাকে। ১৯৭১ সালে স্বাধীন বাংলাদেশের অভ্যুদয়ের পর নতুন রাষ্ট্রের সবকিছুই ঢেলে সাজানোর প্রয়োজন হয়। নতুন রাষ্ট্রে ১৯৭২-এর সংবিধানে স্থানীয় সরকারব্যবস্থার উপর বিশেষ গুরুত্বারোপ করা হয়।

বাংলাদেশে বর্তমানে তিন স্তরবিশিষ্ট স্থানীয় সরকার কাঠামো লক্ষ করা যায়। যথা– ইউনিয়ন পরিষদ, থানা/উপজেলা পরিষদ ও জেলা পরিষদ। এছাড়া শহরগুলোতে পৌরসভা, ১১টি বড় শহরে সিটি কর্পোরেশন, পার্বত্য চট্টগ্রাম আঞ্চলিক পরিষদ ও তিন পার্বত্য জেলায় তিনটি (খাগড়াছড়ি, বান্দরবান, রাঙামাটি) স্থানীয় জেলা পরিষদ রয়েছে। উল্লিখিত তিন স্তরের মধ্যে ইউনিয়ন পরিষদকেই নিচের দিকে সবচেয়ে কার্যকর ইউনিট বলে মনে করা হয়ে থাকে।

গ্রাম বা এর নিকটবর্তী হচ্ছে ইউনিয়ন ও উপজেলা পরিষদ। শহর এলাকায় রয়েছে পৌরসভা, জেলা পরিষদ ও সিটি কর্পোরেশন। এছাড়া পার্বত্য এলাকার জন্য বিশেষ স্থানীয় সরকারের ব্যবস্থা রয়েছে।

বাংলাদেশের স্থানীয় সরকার

স্থানীয় সরকার মন্ত্রণালয়ের অধীন		**পার্বত্য চট্টগ্রামবিষয়ক মন্ত্রণালয়ের অধীন**
গ্রামভিত্তিক স্থানীয় সরকার	**শহরভিত্তিক স্থানীয় সরকার**	**পার্বত্য চট্টগ্রাম আঞ্চলিক পরিষদ**
উপজেলা পরিষদ (৪৮৭)	জেলা পরিষদ (৬১)	১। বান্দরবান পাহাড়ি জেলা পরিষদ
ইউনিয়ন পরিষদ (৪৫৫০)	সিটি কর্পোরেশন (১১)	২। রাঙামাটি পাহাড়ি জেলা পরিষদ
	পৌরসভা (৩১৪)	৩। খাগড়াছড়ি পাহাড়ি জেলা পরিষদ

উল্লেখ্য বাংলাদেশে প্রতিটি স্থানীয় সরকারব্যবস্থায় মহিলাদের প্রতিনিধিত্বের উপর গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে।

এবার আমরা বিভিন্ন স্থানীয় সরকার সম্পর্কে জানব।

ইউনিয়ন পরিষদ

গঠন

গড়ে ১০-১৫টি গ্রাম নিয়ে একটি ইউনিয়ন পরিষদ গঠিত। এর একজন নির্বাচিত চেয়ারম্যান, ৯ টি ওয়ার্ড থেকে নয়জন নির্বাচিত সাধারণ সদস্য ও তিনজন নির্বাচিত মহিলা সদস্য (সংরক্ষিত আসনে) রয়েছেন। একটি ইউনিয়ন ৯টি ওয়ার্ডে বিভক্ত।

মহিলা সদস্যগণ প্রতি ৩ ওয়ার্ডে ১ জন–এই ভিত্তিতে জনগনের সরাসরি ভোটে নির্বাচিত হন। ইউনিয়ন পরিষদে একজন বেতনভুক্ত সচিব থাকে। ইউনিয়ন পরিষদের কার্যকাল ৫ বছর। তবে মেয়াদ পূর্তির পূর্বেও দুই-তৃতীয়াংশ সদস্যের অনাস্থা ভোটের মাধ্যমে চেয়ারম্যান ও অন্য যেকোনো সদস্যকে অপসারণ করা যায়। বাংলাদেশে সর্বমোট ৪৫৫০ টি ইউনিয়ন পরিষদ রয়েছে।

কার্যাবলি

ইউনিয়ন পরিষদ গ্রামীণ জীবনে খুব গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। গ্রামীণ সমস্যা দূরীকরণ, গণসচেতনতা বৃদ্ধি ও দায়িত্বশীল নেতৃত্ব তৈরি করার লক্ষ্যে ইউনিয়ন পরিষদ অনেক কাজ করে। নিম্নে সেগুলো আলোচনা করা হলো :

১. ইউনিয়ন পরিষদ রাস্তাঘাট, সেতু, কালভার্ট নির্মাণ ও রক্ষণাবেক্ষণ এবং রাস্তার ধারে বৃক্ষরোপণ করে।

২. কৃষি উন্নয়নের জন্য ইউনিয়ন পরিষদ উন্নতমানের বীজ, সার ও কীটনাশক সরবরাহ ও অধিক খাদ্য উৎপাদনে উৎসাহ প্রদান করে।

৩. মৎস্য চাষ, পশুপালন ও পশুসম্পদ উন্নয়নের জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করে।

৪. জনস্বাস্থ্য রক্ষার জন্য ইউনিয়ন পরিষদ পরিবেশ পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন রাখার ব্যবস্থা করে। ময়লা আবর্জনা ফেলা, প্রাণী জবাই, গবাদি পশুর গোসল, ময়লা কাপড়-চোপড় ধোয়া ইত্যাদি নিয়ন্ত্রণ করে।

৫. প্রাথমিক চিকিৎসার জন্য দাতব্য হাসপাতাল প্রতিষ্ঠা করে।

৬. ইউনিয়ন পরিষদ জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণে গণসচেতনতা তৈরি করে এবং জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণের জন্য প্রয়োজনীয় উপকরণ অল্প খরচে সহজে পাওয়ার ব্যবস্থা করে।

৭. শিক্ষা বিস্তার ও নিরক্ষরতা দূরীকরণের জন্য ইউনিয়ন পরিষদ দরিদ্র ও মেধাবী শিক্ষার্থীদের বৃত্তি প্রদান, বয়স্ক শিক্ষাদান কেন্দ্র ও লাইব্রেরি স্থাপন ইত্যাদি করে।

৮. জনগণের অর্থনৈতিক উন্নয়নের জন্য কুটির শিল্প স্থাপন ও সমবায় আন্দোলন পরিচালনা করে এবং এ ব্যাপারে জনগণকে উৎসাহিত করে।

৯. ইউনিয়ন পরিষদ নিজ অফিসের ব্যয় নির্বাহের জন্য বিভিন্ন ধরনের কর ধার্য ও আদায় করে এবং বিভিন্ন ধরনের রাজস্ব সংগ্রহে সরকারকে সহায়তা করে।

১০. ইউনিয়ন পরিষদ জন্ম-মৃত্যু ও বিবাহ রেজিস্টার রক্ষণাবেক্ষণ করে।

১১. বন্যা ও অন্যান্য প্রাকৃতিক দুর্যোগের সময় ইউনিয়ন পরিষদ দুস্থদের সাহায্য ও পুনর্বাসনের ব্যবস্থা করে।

১২. ইউনিয়ন পরিষদ গ্রামীণ জীবনের বিভিন্ন বিরোধ নিষ্পত্তির ব্যবস্থা করে। সর্বোচ্চ পাঁচ (০৫) হাজার টাকা দাবির দেওয়ানি ও ছোটখাটো ফৌজদারি মামলার বিচার ইউনিয়ন পরিষদ করতে পারে।

আয়ের উৎস

ইউনিয়ন পরিষদের আয়ের উৎস :

ক. বাড়িঘর, দালান-কোঠার উপর কর

খ. জন্ম, বিবাহ ও ভোজের উপর ফি

গ. সিনেমা, থিয়েটার, যাত্রা, সার্কাস, মেলা ইত্যাদির উপর কর

ঘ. যানবাহনের উপর কর

ঙ. লাইসেন্স, পারমিট ফি

চ. জনস্বার্থে বিশেষ কল্যাণকর কাজের জন্য ফি

ছ. হাট বাজার, জলমহাল, ফেরিঘাট ইজারা ও টোল সংগ্রহ

জ. সরকার কর্তৃক প্রদত্ত বরাদ্দ/অনুদান ইত্যাদি ।

দলগত কাজ : ১. শহর ও গ্রামভিত্তিক স্থানীয় সরকারের একটি তালিকা তৈরি কর ।

২. ইউনিয়ন পরিষদের আয়ের উৎসের একটি তালিকা তৈরি কর ।

উপজেলা পরিষদ

আমাদের দেশে থানা/উপজেলা একটি গুরুত্বপূর্ণ প্রশাসনিক স্তর ।

গঠন

একজন চেয়ারম্যান, দুজন ভাইস চেয়ারম্যান (এদের মধ্যে একজন হবেন মহিলা) এবং উপজেলার আওতাধীন ইউনিয়ন পরিষদসমূহের চেয়ারম্যানবৃন্দ, পৌরসভার (যদি থাকে) মেয়র এবং তিনজন মহিলা সদস্যের সমন্বয়ে উপজেলা পরিষদ গঠিত হয়। ২০০৯ সালের উপজেলা পরিষদ আইন অনুযায়ী সংসদ সদস্যদেরকে পরিষদের পরামর্শকের ভূমিকা প্রদান করা হয়েছে। চেয়ারম্যান উপজেলার ভোটারদের প্রত্যক্ষ ভোটে নির্বাচিত হন ।

ইউনিয়ন পরিষদ চেয়ারম্যান ও পৌরসভার (যদি থাকে) মেয়রবৃন্দ পদাধিকারবলে এর সদস্য হবেন। ইউনিয়ন পরিষদ ও পৌরসভার (যদি থাকে) নির্বাচিত মহিলা সদস্যদের ভোটে তাদের মধ্য থেকে তিনজন মহিলা সদস্য নির্বাচিত হবেন। উপজেলা নির্বাহী অফিসার (ইউএনও) পরিষদের নির্বাহী কর্মকর্তা বা সচিবের দায়িত্ব পালন করবেন। পরিষদের কার্যকাল হবে ৫ বছর। বর্তমানে বাংলাদেশে ৪৮৭টি উপজেলা রয়েছে।

কার্যাবলি

উপজেলা পরিষদের কাজগুলো নিচে আলোচনা করা হলো ।

১. ইউনিয়ন পরিষদের উন্নয়ন কার্যক্রমের সমন্বয়সাধন করে ।

২. যোগাযোগ ও ভৌত অবকাঠামো উন্নয়নের জন্য আন্তঃইউনিয়ন সংযোগকারী রাস্তা নির্মাণ, মেরামত ও রক্ষণাবেক্ষণ করে।

৩. মহিলা ও শিশু উন্নয়ন, সমাজকল্যাণ, যুব, ক্রীড়া ও সাংস্কৃতিক উন্নয়নে সহায়তা দান করে।

৪. কৃষি উন্নয়নের লক্ষ্যে পশু পালন, মৎস্য চাষ, বনজ সম্পদ উন্নয়ন ও সেচ প্রকল্প গ্রহণসহ বিভিন্ন উন্নয়ন কার্যক্রম গ্রহণ করে।

৫. নারী ও শিশু নির্যাতন প্রতিরোধে জনমত গঠনসহ প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করে।

৬. প্রাকৃতিক পরিবেশ সংরক্ষণ ও উন্নয়নের লক্ষ্যে সামাজিক বনায়ন কার্যক্রম গ্রহণ করে।

৭. ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্প স্থাপন ও বিকাশের জন্য কার্যক্রম গ্রহণ করে।

৮. শিক্ষা প্রসারের জন্য মাধ্যমিক ও মাদ্রাসা শিক্ষা কার্যক্রমের মান উন্নয়নের জন্য সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানগুলোর কার্যক্রম তদারক করে।

৯. নিরাপদ খাবার পানি সরবরাহ ও পয়নিষ্কাশন ব্যবস্থার উন্নয়ন নিশ্চিত করে।

১০. উপজেলা আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতির উন্নয়নসহ পুলিশ বিভাগের কার্যক্রম আলোচনা করে।

১১. আত্মকর্মসংস্থান সৃষ্টি ও দারিদ্র্য বিমোচনের লক্ষ্যে কর্মসূচি গ্রহণ করে।

১২. সরকার কর্তৃক প্রদত্ত অন্যান্য কার্যক্রম সম্পাদন করে।

আয়ের উৎস

উপজেলা পরিষদ কর্তৃক ধার্যকৃত কর, রেইট, টোল, ফি এবং সরকার ও অন্যান্য উৎস থেকে প্রাপ্ত অর্থ বা অনুদান ইত্যাদি নিয়ে উপজেলা পরিষদের তহবিল গঠিত হবে।

একক কাজ : ইউনিয়ন পরিষদ ও উপজেলা পরিষদ গঠনের পার্থক্যসমূহের একটি তালিকা প্রস্তুত কর।

দলীয় কাজ : উপজেলা পরিষদের কার্যাবলির একটি তালিকা তৈরি কর।

জেলা পরিষদ

জেলা পরিষদের চেয়ারম্যান জেলার জনগণ দ্বারা সরাসরি নির্বাচনের বিধান রাখা হয়। জেলা পরিষদের চেয়ারম্যান একজন প্রতিমন্ত্রীর মর্যাদার অধিকারী এবং জেলা প্রশাসককে তার অধীনে প্রধান নির্বাহী করা হয়। সংসদ সদস্য এই পরিষদে পরামর্শকের ভূমিকা পালন করেন। তবে বর্তমানে সরকার জেলা পরিষদে নির্বাচিত চেয়ারম্যানের বদলে একজন করে প্রশাসক নিয়োগ দিয়েছেন।

গঠন

২০০০ সালের জেলা পরিষদ আইন অনুযায়ী জেলা পরিষদ গঠিত হবে একজন চেয়ারম্যান, পনেরজন সদস্য এবং সংরক্ষিত আসনে ৫ জন মহিলা সদস্য নিয়ে। এরা সবাই একটি নির্দিষ্ট জেলার অধীন সিটি কর্পোরেশনের মেয়র, কমিশনারবৃন্দ, ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান এবং সদস্যদের ভোটে নির্বাচিত হবেন। এই পরিষদের মেয়াদ হবে পাঁচ বছর।

কার্যাবলি

২০০০ সালের আইনের অধীনে জেলা পরিষদকে ১২টি বাধ্যতামূলক এবং ৬৮টি ঐচ্ছিক কার্যাবলির দায়িত্ব দেওয়া হয়। জেলা পরিষদের উল্লেখযোগ্য কাজের মধ্যে রয়েছে পরিকল্পনা এবং উন্নয়ন, শিল্প এবং বাণিজ্যের উন্নয়ন, সরকারি হাসপাতাল তত্ত্বাবধান, পারিবারিক ক্লিনিক, শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের উন্নয়ন। সেই সাথে আন্তঃজেলা সড়ক প্রকল্প প্রস্তুতকরণ এবং চলমান পুলিশি কর্মকাণ্ডের তত্ত্বাবধান, আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতি উন্নয়নে সহায়তা, সন্ত্রাস দমনে সুপারিশ এবং উপজেলা কর্মকাণ্ডের তদারক। জেলা পরিষদ ৫ বছর মেয়াদি উন্নয়ন পরিকল্পনা তৈরি করে এবং স্থানীয় সরকার ও পল্লী উন্নয়ন মন্ত্রণালয়ের মাধ্যমে পরিকল্পনা কমিশনে অনুমোদনের জন্য পাঠায়।

আয়ের উৎস

জেলা পরিষদ আইন ১৯৯৮ অনুযায়ী জেলা পরিষদের ৮টি আয়ের উৎস আছে। কর, টোল, ফিস, সম্পত্তি হতে প্রাপ্ত আয়/ মুনাফা, ব্যাক্তি, সরকার ও অনান্য প্রতিষ্ঠান কতৃক প্রদত্ত অনুদান, বিনিয়োগ হতে প্রাপ্ত আয় এবং অনান্য উৎস হতে প্রাপ্ত অর্থ। জেলা পরিষদের জন্য জমি হস্তান্তর করের ১ শতাংশ এবং ৫ শতাংশ ভূমি কর রাখার ব্যবস্থা করা। এছাড়া হাট-বাজার, ফেরিঘাট এবং জলমহাল থেকে বর্ধিত পরিমাণ লিজের অর্থ জেলা পরিষদ পাবে। তবে গঠনতন্ত্রে যেভাবে বলা আছে, জেলা পরিষদ সম্পূর্ণ সেভাবে এখনও কার্যকর নয়।

পৌরসভা

গ্রামে যেমন ইউনিয়ন পরিষদ, তেমনি শহরের জন্য রয়েছে পৌরসভা। বর্তমানে বাংলাদেশে ৩১৪টি পৌরসভা রয়েছে।

গঠন

স্থানীয় সরকার (পৌরসভা) আইন ২০০৯ অনুযায়ী পৌরসভা গঠিত হবে একজন মেয়র, সরকারি গেজেট প্রজ্ঞাপন দ্বারা নির্ধারিত সংখ্যক ওয়ার্ডের সমানসংখ্যক কাউন্সিলর এবং কেবল মহিলাদের জন্য সংরক্ষিত নির্ধারিত সংখ্যক কাউন্সিলরের সমন্বয়ে। এই সকল পদেই জনগণের দ্বারা প্রত্যক্ষ ভোটে নির্বাচিত হওয়ার বিধান রাখা হয়েছে।

কার্যাবলি

পৌরসভা শহরের জনগণের স্থানীয় বহুবিধ সমস্যার সমাধান এবং উন্নয়নমূলক কাজের দায়িত্ব পালন করে। এই দায়িত্ব পালন করতে গিয়ে পৌরসভাকে বহুবিধ কাজ করতে হয়। উল্লেখযোগ্য কাজগুলো নিম্নে আলোচনা করা হলো।

১. পৌর এলাকায় শিক্ষা বিস্তারের জন্য শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান স্থাপন, শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের উন্নয়নের জন্য অনুদান প্রদান, হোস্টেল নির্মাণ, মেধাবী ও দরিদ্র শিক্ষার্থীদের বৃত্তি প্রদান, বয়স্ক শিক্ষা কেন্দ্র ও নৈশ বিদ্যালয় স্থাপন, পাঠাগার স্থাপন করা ইত্যাদি কাজ করে।

২. পৌরসভা শহরের জনস্বাস্থ্য রক্ষামূলক কার্যাদি সম্পন্ন করে। জনস্বাস্থ্য রক্ষার জন্য রাস্তাঘাট, পুকুর, নর্দমা ও ডাস্টবিন নির্মাণ করে। সংক্রামক ও মহামারী ব্যাধি প্রতিরোধ ও প্রতিষেধক দানের ব্যবস্থা করে। হাসপাতাল, মাতৃসদন, শিশুসদন, পরিবার পরিকল্পনা কেন্দ্র নির্মাণ ও পরিচালনার ব্যবস্থা করে।

৩. মৃতদেহ দাফনের জন্য গোরস্তান, সৎকারের জন্য শ্মশান ইত্যাদি নির্মাণ ও রক্ষণাবেক্ষণ করে। অনাথ ও দুস্থদের জন্য এতিমখানা ও আশ্রম নির্মাণ করে।

৪. জনগণের জন্য নিরাপদ খাওয়ার পানির ব্যবস্থা এবং আবদ্ধ পানি নিষ্কাশনের ব্যবস্থা করে।

৫. পৌর এলাকার জনগণের জীবন ও সম্পত্তি রক্ষার জন্য নৈশপ্রহরী নিয়োগ করে। অপরাধমূলক ও বিপজ্জনক খেলা ও পেশা নিয়ন্ত্রণ করে।

৬. পৌরসভা এলাকার পরিবেশ উন্নয়ন ও সৌন্দর্য বর্ধনের জন্য রাস্তার ধারে বৃক্ষরোপণ ও বন সংরক্ষণ করে। জনগণের বিনোদনের জন্য পার্ক ও উদ্যান নির্মাণ, মিলনায়তন স্থাপন এবং উন্মুক্ত প্রাঙ্গণ সংরক্ষণ করে।

৭. পৌর এলাকায় গবাদি পশু ও হাঁস-মুরগি পালন, খামার স্থাপন, গবাদি পশু ও হাঁস-মুরগির চিকিৎসার ব্যবস্থা করা, গবাদি পশু বিক্রি ও রেজিস্ট্রিকরণ, বিপজ্জনক পশু আটক ও হত্যা, পশুর মৃতদেহ অপসারণ ইত্যাদি কাজ করে।

৮. খাদ্যে ভেজাল প্রতিরোধে, পচা ও ভেজাল খাবার বিক্রি বন্ধে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করে। মাদকজাতীয় খাদ্য ও পানীয় অবাধে বিক্রি বন্ধের জন্য এসব দ্রব্য প্রস্তুত, ক্রয়-বিক্রয় এবং সরবরাহের উপর বিধিনিষেধ আরোপ করে। বিধিনিষেধ লঙ্ঘনকারীকে শাস্তি দেয়।

৯. পরিকল্পিত শহর গড়ার জন্য পৌরসভা বাড়িঘর নির্মাণের অনুমতি দেয়। অননুমোদিত ও বেআইনি নির্মাণ ভেঙে দেয়।

১০. সুপরিকল্পিত সুন্দর শহর গড়া এবং পরিবেশের ভারসাম্য রক্ষার জন্য পৌরসভা মহাপরিকল্পনা গ্রহণ ও বাস্তবায়ন করে।

১১. পৌরসভা যানবাহন চলাচল নিয়ন্ত্রণ করে এবং মোটরগাড়ি ছাড়া অন্যান্য যানবাহনের লাইসেন্স প্রদান করে।

১২. প্রাকৃতিক দুর্যোগের সময় পৌরসভা দুর্গতদের সাহায্য, সেবা এবং ত্রাণের ব্যবস্থা করে।

১৩. পৌরসভা শান্তিপূর্ণ পরিবেশ রক্ষার জন্য সন্ত্রাস দমন ও শান্তি-শৃঙ্খলা ভঙ্গকারীর বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণ করে।

১৪. পৌরসভা সর্বোচ্চ পাঁচ হাজার টাকা মূল্য জড়িত দেওয়ানি ও ছোটখাটো ফৌজদারি মামলার বিচার করতে পারে। এজন্য মেয়র ও চারজন কাউন্সিলরের সমন্বয়ে আদালত গঠন করা হয়।

আয়ের উৎস

বিভিন্ন উৎস থেকে প্রাপ্ত অর্থ দিয়ে পৌরসভা তার ব্যয়ভার নির্বাহ করে থাকে। এর মধ্যে উল্লেখযোগ্য হচ্ছে– ঘরবাড়ি, দোকানপাট, বিদ্যুৎ, পানি ও অন্যান্য সেবা এবং বিনোদনমূলক বিষয়ের উপর ধার্য কর, মার্কেট ভাড়া, হাট-বাজার ও খেয়াঘাট ইজারা, লাইসেন্স-পারমিট, যানবাহন রেজিস্ট্রেশন ফি, সরকারি বরাদ্দ ইত্যাদি।

সিটি কর্পোরেশন

বাংলাদেশের কয়েকটি প্রধান শহরকে কেন্দ্র করে সিটি কর্পোরেশনগুলো গড়ে উঠেছে। বাংলাদেশের মোট ১১টি সিটি কর্পোরেশন রয়েছে। এগুলো হলো ঢাকায় দুইটি (ঢাকা উত্তর ও ঢাকা দক্ষিণ), চট্টগ্রাম, রাজশাহী, খুলনা, সিলেট, বরিশাল, রংপুর, নারায়ণগঞ্জ, কুমিল্লা ও গাজীপুর ।

গঠন

প্রত্যেক সিটি কর্পোরেশন নির্ধারিত সংখ্যক ওয়ার্ডে বিভক্ত থাকে। একজন মেয়র, নির্ধারিত ওয়ার্ডের সমানসংখ্যক কাউন্সিলর এবং নির্ধারিত ওয়ার্ডের এক-তৃতীয়াংশ সংখ্যক সংরক্ষিত আসনের মহিলা কাউন্সিলর নিয়ে সিটি কর্পোরেশন গঠিত হয়। মেয়র ও কাউন্সিলরগণ জনগণের সরাসরি ভোটে নির্বাচিত হন এবং সংরক্ষিত আসনের মহিলা কাউন্সিলরগণ নির্বাচিত হন কাউন্সিলরদের ভোটে। সিটি কর্পোরেশনের মেয়র প্রতিমন্ত্রীর মর্যাদা ভোগ করেন। সিটি কর্পোরেশনের মেয়াদ ৫ (পাঁচ) বছর।

কার্যাবলি

মহানগর এলাকার শান্তি-শৃঙ্খলা রক্ষা, বিভিন্ন সমস্যার সমাধান এবং উন্নয়নের জন্য সিটি কর্পোরেশন বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ কাজ সম্পাদন করে থাকে। নিচে তা আলোচনা করা হলো।

১. সিটি কর্পোরেশন মহানগরীর রাস্তাঘাট নির্মাণ ও রক্ষণাবেক্ষণ করে। মোটরগাড়ি, বাস, ট্রাক ছাড়া অন্যান্য যানবাহনের লাইসেন্স প্রদান করে এবং রাস্তায় যানবাহন চলাচল নিয়ন্ত্রণ করে।

২. জনস্বাস্থ্য রক্ষার জন্য সিটি কর্পোরেশন নালা-নর্দমা, রাস্তাঘাট, আবাসিক এলাকা পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন রাখে। ময়লা আবর্জনা ফেলার জন্য ডাস্টবিন নির্মাণ, বিভিন্ন স্থানে শৌচাগার, স্বাস্থ্যসম্মত পায়খানা ইত্যাদি নির্মাণ করে। এছাড়া হাসপাতাল, মাতৃসদন, শিশুসদন, পরিবার পরিকল্পনা কেন্দ্র নির্মাণ ও পরিচালনা করে।

৩. জনসাধারণের জন্য নিরাপদ খাওয়ার পানি সরবরাহ, কূপ ও নলকূপ খনন এবং আবদ্ধ পানি নিষ্কাশনের ব্যবস্থা করে।

৪. সিটি কর্পোরেশন মহানগর এলাকায় পচা-বাসি ও ভেজাল খাদ্যদ্রব্য বিক্রি ও সরবরাহের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণ করে। খাদ্য ও পানীয় সরবরাহ নিয়ন্ত্রণ করে। খাদ্য ও পানীয় প্রস্তুত, আমদানি ও নিয়ন্ত্রণের ক্ষেত্রে লাইসেন্স প্রদান করে।

৫. মহানগর এলাকায় গবাদি পশু ও হাঁস-মুরগি চিকিৎসা কেন্দ্র স্থাপন, গবাদি পশু রেজিস্ট্রিকরণ, বিপজ্জনক পশু আটক ও হত্যা, পশুর মৃতদেহ অপসারণ, হাঁস-মুরগির খামার স্থাপন ইত্যাদি কাজ করে।

৬. মহানগরীর গরিব-দুঃখী মানুষকে সাহায্য করা, অনাথ আশ্রম ও জনকল্যাণ কেন্দ্র স্থাপন, ভিক্ষাবৃত্তি ও পতিতাবৃত্তি রোধ ও পুনর্বাসন, জুয়াখেলা, মাদকাসক্তি ও অসামাজিক কাজ প্রতিরোধের ব্যবস্থা করে।

৭. প্রাকৃতিক দুর্যোগ মোকাবেলায় সিটি কর্পোরেশন ক্ষতিগ্রস্তদের সাহায্য ও পুনর্বাসনের ব্যবস্থা করে।

৮. মহানগরীর নিরক্ষরতা দূরীকরণের জন্য বয়স্ক শিক্ষা কেন্দ্র, নৈশ বিদ্যালয় স্থাপন করে। শিক্ষা বিস্তারের জন্য নতুন শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান স্থাপন, শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে অনুদান প্রদান, হোস্টেল নির্মাণ, বৃত্তি প্রদান, পাঠাগার নির্মাণ ও পরিচালনা ইত্যাদি কাজ করে।

৯. সাংস্কৃতিক উন্নয়নের জন্য সিটি কর্পোরেশন মিলনায়তন, আর্ট-গ্যালারি, তথ্যকেন্দ্র, জাদুঘর, মুক্তমঞ্চ ইত্যাদি নির্মাণ করে।

১০. মহানগরের পরিবেশের উন্নয়ন ও সৌন্দর্য বর্ধনের জন্য সিটি কর্পোরেশন রাস্তার পাশে ও উন্মুক্ত স্থানে বৃক্ষরোপণ ও বন সংরক্ষণ করে। জনসাধারণের অবকাশ যাপনের জন্য উদ্যান নির্মাণ করে।

১১. সিটি কর্পোরেশন মহানগর এলাকায় ঘরবাড়ি নির্মাণের অনুমতি প্রদান করে। অননুমোদিত ঘরবাড়িসহ সকল স্থাপনা ভেঙে দেয় এবং অবৈধ দখলদার উচ্ছেদের ব্যবস্থা করে।

১২. সিটি কর্পোরেশন জন্ম-মৃত্যু নিবন্ধন করে।

১৩. মহানগরীর শান্তি-শৃঙ্খলা বজায় রাখার জন্য সিটি কর্পোরেশন ছোটখাটো বিচারকাজ সম্পাদন করে। বিবাদ মীমাংসা ও মহল্লায় শান্তি রক্ষার জন্য শান্তিরক্ষী নিয়োগ করে। মহানগরীতে চুরি-ডাকাতি, হাইজ্যাকরোধ ও সন্ত্রাস দমনে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করে।

১৪. সর্বোপরি মহানগরীর সার্বিক উন্নয়নের জন্য সিটি কর্পোরেশন উন্নয়ন পরিকল্পনা গ্রহণ ও বাস্তবায়ন করে।

আয়ের উৎস

ক. সিটি কর্পোরেশন কর্তৃক আরোপিত যেকোনো কর, উপকর, টোল ও ফিস ইত্যাদি;

খ. কর্পোরেশনের উপর ন্যস্ত এবং তৎকর্তৃক পরিচালিত সকল সম্পত্তি হতে প্রাপ্ত আয় বা মুনাফা;

গ. সরকার বা অন্যান্য কর্তৃপক্ষের নিকট হতে প্রাপ্ত অনুদান;

ঘ. স্থানীয় কর্তৃপক্ষ বা অন্য কোনো প্রতিষ্ঠান বা ব্যক্তিবিশেষ কর্তৃক প্রদত্ত দান;

ঙ. কর্পোরেশনের উপর ন্যস্ত সব ট্রাস্ট হতে প্রাপ্ত আয়;

চ. কর্পোরেশনের অর্থ বিনিয়োগ হতে প্রাপ্ত মুনাফা;

ছ. অন্যান্য উৎস হতে প্রাপ্ত অর্থ;

জ. আইনের অধীন অর্থদণ্ড থেকে প্রাপ্ত অর্থ ইত্যাদি।

একক কাজ : সিটি কর্পোরেশনের বিভিন্ন করের উৎসের একটি তালিকা প্রস্তুত কর।

পার্বত্য চট্টগ্রাম অঞ্চলে বিশেষ স্থানীয় সরকারব্যবস্থা

পার্বত্য চট্টগ্রাম অঞ্চলে বিশেষ স্থানীয় সরকারব্যবস্থা গড়ে উঠার প্রেক্ষাপট অন্যান্য স্থানীয় সরকার থেকে আলাদা। ঐতিহাসিকভাবে পার্বত্য চট্টগ্রামের ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীর সংস্কৃতি ও জীবনযাপন পদ্ধতি বাঙালিদের চেয়ে ছিল সম্পূর্ণ আলাদা। এ আলাদা পরিচয় প্রতিষ্ঠার জন্য তারা দীর্ঘদিন ধরে সংগ্রাম করে আসছিল। তাদের দাবির ফলেই ১৯৯৭ সালের ২ ডিসেম্বর শান্তিচুক্তি সম্পাদিত হয়। এই চুক্তির মাধ্যমে এ অঞ্চলে ভিন্ন প্রকৃতির স্থানীয় সরকার কাঠামো গড়ে উঠেছে।

পার্বত্য জেলা পরিষদ

পার্বত্য চট্টগ্রাম বিভিন্ন ক্ষুদ্র জনগোষ্ঠী অধ্যুষিত একটি অঞ্চল। এছাড়া মূলধারার বাঙালিরাও সেখানে বসবাস করে। এসব অঞ্চলে রয়েছে বিভিন্ন সমস্যা, যা সমাধানে প্রয়োজন বিভিন্ন পদক্ষেপ। এ ছাড়া এ অঞ্চলের প্রকৃতি ও জীবন ধারা আলাদা হওয়ায় এ অঞ্চলের উন্নয়নের জন্য প্রয়োজন বিশেষ ধরনের ব্যবস্থা। এ কারনে রাঙামাটি, খাগড়াছড়ি ও বান্দরবান এ তিন পার্বত্য জেলায় তিনটি বিশেষ ধরনের জেলা স্থানীয় সরকার পরিষদ প্রবর্তন করা হয়। পূর্বে পরিষদের মেয়াদ ছিল ৩ বছর। বর্তমানে তা বাড়িয়ে ৫ বছর করা হয়েছে।

গঠন-কাঠামো ও প্রকৃতি

প্রত্যেকটি জেলা পরিষদ ১ জন চেয়ারম্যান, ৩০ জন সাধারণ সদস্য এবং ৩ জন মহিলা সদস্যসহ সর্বমোট ৩৪ জন সদস্য নিয়ে গঠিত হবে। এদের সকলে জনগণের প্রত্যক্ষ ভোটে নির্বাচিত হবেন। সদস্যদের মধ্যে পাহাড়ি ও বাঙালি উভয় পক্ষের প্রতিনিধি থাকবে। জনসংখ্যার অনুপাত অনুযায়ী কার সংখ্যা কত তা নির্ধারিত হবে। অপরদিকে, মহিলা আসন ব্যতীত পাহাড়িদের জন্য রিজার্ভ আসন বিভিন্ন ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীর মধ্যে বণ্টন হবে। ৩ জন মহিলা সদস্যের মধ্যে ২ জন হবেন ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীর এবং ১ জন হবেন ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীর বাইরের বা বাঙালি। চেয়ারম্যান অবশ্যই ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীর মধ্য থেকে হবেন। সদস্যদের আসনসংখ্যা দু'সম্প্রদায়ের মধ্যে ভাগ করে দেওয়া হলেও ভোটদান হবে সকলের ভিত্তিতে। সংরক্ষিত রিজার্ভ আসন ছাড়াও অন্য আসনে মহিলারা নির্বাচনে প্রার্থী হতে পারবে। একজন সরকারি কর্মকর্তা পরিষদের সচিবের দায়িত্ব পালন করবেন। পরিষদের কার্যকাল হবে ৫ বছর।

দলীয় কাজ : পার্বত্য চট্টগ্রামের বিশেষ স্থানীয় সরকার পদ্ধতির সাথে দেশের অন্যান্য স্থানীয় সরকারের পার্থক্যের উপর একটি পোস্টার তৈরি কর।

কার্যাবলি

পার্বত্য জেলা পরিষদের কার্যাবলি নিম্নরূপ :

১. স্থানীয় পুলিশ ও জেলার আইন-শৃঙ্খলা সংরক্ষণ, তত্ত্বাবধান ও উন্নতি সাধন।

২. জেলার স্থানীয় কর্তৃপক্ষসমূহের উন্নয়নমূলক কর্মকাণ্ডের সমন্বয়সাধন ও বাস্তবায়নে সহযোগিতা দান।

৩. শিক্ষার উন্নয়ন ও বিস্তার এবং প্রয়োজনীয় সুযোগ-সুবিধা সৃষ্টি।

৪. স্বাস্থ্যরক্ষা, জনস্বাস্থ্য উন্নয়ন ও পরিবার পরিকল্পনা কর্মসূচি বাস্তবায়ন।

৫. কৃষি ও বন উন্নয়ন ও রক্ষণাবেক্ষণ।

৬. পশুপালন।

৭. মৎস্য সম্পদ উন্নয়ন।

৮. সমবায় আন্দোলনে উৎসাহ প্রদান।

৯. স্থানীয় শিল্প, ব্যবসা ও বাণিজ্যের প্রসার।

১০. অনাথ ও দুস্থদের জন্য আশ্রয় কেন্দ্র নির্মাণসহ অন্যান্য সমাজকল্যাণমূলক কর্মকাণ্ড।

১১. ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীর সংস্কৃতি সংরক্ষণ ও এর বিকাশ সাধন। ক্রীড়া ও খেলাধুলার আয়োজন ও উন্নয়ন।

১২. যোগাযোগব্যবস্থার উন্নতি সাধন।

১৩. পানি সরবরাহ ও সেচব্যবস্থার উন্নয়ন।

১৪. ভূমি ও ভূমি ব্যবস্থাপনা।

১৫. পরিবেশ সংরক্ষণ ও উন্নয়ন।

১৬. স্থানীয় পর্যটন শিল্পের উন্নয়ন।

১৭. ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীর রীতিনীতি, প্রথার আলোকে পাহাড়ি জনগোষ্ঠীর বিরোধের বিচার ও মীমাংসা।

আয়ের উৎস

পরিষদের আয়ের উৎসের মধ্যে নিম্নে উল্লিখিত বিষয়াবলি অন্তর্ভুক্ত–

ক. স্থাবর সম্পত্তি হস্তান্তরের উপর ধার্য করের অংশ।

খ. ভূমি ও দালান কোঠার উপর হোল্ডিং কর।

গ. রাস্তা, পুল ও ফেরির উপর টোল।

ঘ. যানবাহনের রেজিস্ট্রেশন ফি।

ঙ. পণ্য ক্রয়-বিক্রয়ের উপর কর।

চ. শিল্প প্রতিষ্ঠানের উপর হোল্ডিং কর।

ছ. সামাজিক বিচারের ফি।

জ. লটারির উপর কর।

ঝ. চিত্তবিনোদনমূলক কর্মের উপর কর।

ঞ. বনজ সম্পদের উপর রয়্যালটির অংশবিশেষ।

ট. খনিজ সম্পদ অন্বেষণ বা উত্তোলনের উদ্দেশ্যে সরকার কর্তৃক প্রদত্ত অনুমতিপত্র বা পাট্টা সূত্রে প্রাপ্ত রয়্যালটির অংশবিশেষ।

ঠ. সরকার কর্তৃক পরিষদকে প্রদত্ত ক্ষমতাবলে আরোপিত কোনো কর ।

পার্বত্য চট্টগ্রাম আঞ্চলিক পরিষদ

তিনটি পার্বত্য জেলায় কার্যক্রম সমন্বয় সাধনের লক্ষ্যে ঐ তিন জেলাধীন সমগ্র এলাকাজুড়ে একটি আঞ্চলিক পরিষদ আছে।

গঠন

১ জন চেয়ারম্যান, ১২ জন ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীর সদস্য, ৬ জন ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীর বাইরের বা বাঙালি সদস্য, ২ জন ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীর মহিলা সদস্য, ১ জন ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীর বাইরের বা বাঙালি মহিলা সদস্য এবং তিন পার্বত্য জেলা পরিষদের ৩ চেয়ারম্যানসহ সর্বমোট ২৫ জন সদস্য নিয়ে আঞ্চলিক পরিষদ গঠিত হবে। চেয়ারম্যান অবশ্যই ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীর হবেন এবং তিনি প্রতিমন্ত্রীর মর্যাদা ভোগ করবেন। ১২ জন ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীর সদস্যের মধ্যে ৫ জন চাকমা ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীর, ৩ জন মারমা, ২ জন ত্রিপুরা, ১ জন মুরং ও তনচৈঙ্গা এবং ১ জন লুসাই, বোম, পাংখো, খুমী, চক ও খিয়াং ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীর অন্তর্ভুক্ত হবেন। ৬ জন ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীর সদস্যের মধ্যে প্রতিটি পার্বত্য জেলা হতে ২ জন করে থাকবেন। ২ জন ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীর মহিলা সদস্যের মধ্যে ১ জন চাকমা এবং অপর জন অন্যান্য ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীর মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকবে। ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীর বাইরের বা বাঙালি মহিলা সদস্য তিন পার্বত্য জেলার বাঙালি মহিলাগণের মধ্য থেকে হবেন। তিন পার্বত্য জেলা পরিষদের চেয়ারম্যানগণ ব্যতীত আঞ্চলিক পরিষদের চেয়ারম্যান ও অন্য সকল সদস্য জেলা পরিষদসমূহের সদস্যগণ কর্তৃক পরোক্ষভাবে নির্বাচিত হবেন। তিন পার্বত্য জেলার চেয়ারম্যানগণ পদাধিকারবলে এর সদস্য হবেন এবং তাদের ভোটাধিকার থাকবে। একজন সরকারি কর্মকর্তা পরিষদের নির্বাহী কর্মকর্তা হিসেবে কাজ করবেন। আঞ্চলিক পরিষদের মেয়াদ হবে ৫ বছর।

কার্যাবলি

পার্বত্য চট্টগ্রাম আঞ্চলিক পরিষদের কার্যাবলি হবে নিম্নরূপ–

১. তিন পার্বত্য জেলা পরিষদের অধীনে পরিচালিত সকল উন্নয়ন কর্মকাণ্ডসহ এদের আওতাধীন এবং এদের উপর অর্পিত বিষয়াদির সার্বিক তত্ত্বাবধান ও সমন্বয়।

২. পৌরসভাসহ স্থানীয় পরিষদসমূহ তত্ত্বাবধান ও তাদের কর্মকাণ্ডের সমন্বয়সাধন।

৩. পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ডের কার্যাবলির সার্বিক তত্ত্বাবধান।

৪. পার্বত্য জেলাসমূহের সাধারণ প্রশাসন, আইন-শৃঙ্খলা ও উন্নয়নের তত্ত্বাবধান ও সমন্বয়।

৫. ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীর রীতিনীতি, প্রথা ইত্যাদি এবং সামাজিক বিচার তত্ত্বাবধান ও সমুন্নত রাখা।

৬. জাতীয় শিল্পনীতির সঙ্গে সঙ্গতি রেখে পার্বত্য অঞ্চলে ভারী শিল্প স্থাপনে লাইসেন্স প্রদান।

৭. দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ কার্যক্রম পরিচালনা এবং এনজিওদের কার্যাবলির সমন্বয়সাধন।

আয়ের উৎস

প্রতি অর্থবছর শুরু হওয়ার পূর্বে পরিষদ ঐ বছরের সম্ভাব্য আয় ও ব্যয়-সম্বলিত বিবরণী বা বাজেট প্রণয়ন ও অনুমোদন করবে। নিম্নোক্ত উৎস হতে প্রাপ্ত অর্থ নিয়ে আঞ্চলিক পরিষদের তহবিল গঠিত হবে–

ক. পার্বত্য জেলা পরিষদের তহবিল হতে প্রাপ্ত অর্থ, যার পরিমাণ সময় সময় সরকার নির্ধারণ করবে।

খ. পরিষদের উপর ন্যস্ত এবং তৎকর্তৃক পরিচালিত সকল সম্পত্তি থেকে প্রাপ্ত অর্থ বা মুনাফা।

গ. সরকার বা অন্যান্য কর্তৃপক্ষের ঋণ ও অনুদান।

ঘ. কোনো প্রতিষ্ঠান বা ব্যক্তি কর্তৃক প্রদত্ত অনুদান।

ঙ. পরিষদের অর্থ বিনিয়োগ থেকে অর্জিত মুনাফা।

চ. পরিষদ কর্তৃক প্রাপ্ত যেকোনো অর্থ।

ছ. সরকারের নির্দেশে পরিষদের উপর ন্যস্ত অন্যান্য আয়ের উৎস থেকে প্রাপ্ত অর্থ ইত্যাদি।

সরকারের সঙ্গে পার্বত্য জেলা ও আঞ্চলিক পরিষদের সম্পর্ক

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধানের আওতায় বিশেষ ব্যবস্থা হিসাবে পার্বত্য জেলা পরিষদ ও আঞ্চলিক পরিষদ গঠন করা হয়েছে। উভয় পরিষদকে আইন অনুযায়ী নির্দিষ্ট ক্ষমতা ও কর্তৃত্ব প্রদান করা হয়েছে। উদাহরণস্বরূপ, জেলা পরিষদের নিয়ন্ত্রণ ও আওতাধীন কোনো প্রকারের জমি, পাহাড় ও বনাঞ্চল পরিষদের সাথে আলোচনা ও পরিষদের সম্মতি ব্যতিরেকে সরকার কর্তৃক অধিগ্রহণ ও হস্তান্তর করা যাবে না। আইন প্রণয়ন-সংক্রান্ত ব্যাপারে বলা হয়েছে, সরকার আঞ্চলিক পরিষদ বা পার্বত্য চট্টগ্রাম সম্পর্কে কোনো আইন প্রণয়নের উদ্যোগ গ্রহণ করলে পরিষদ ও সংশ্লিষ্ট পার্বত্য জেলা পরিষদের সাথে আলোচনাক্রমে এবং পরিষদের পরামর্শ বিবেচনাক্রমে আইন প্রণয়নের জন্য প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করবে। জেলা ও আঞ্চলিক পরিষদ আইনের বা কোনো বিধি-বিধানের সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ বিধি প্রণয়ন করতে পারবে। যাহোক, আইন প্রণয়নের ক্ষমতা সরকারের হাতে ন্যস্ত। অপরদিকে, সরকার প্রয়োজন দেখা দিলে জেলা পরিষদের কাজকর্মের ব্যাপারে নির্দেশ প্রদান বা অনুশাসন এবং গেজেট আদেশ দ্বারা আঞ্চলিক পরিষদ বাতিল ঘোষণা পর্যন্ত করতে পারবে।

নাগরিকতা বিকাশে স্থানীয় সরকার

বাংলাদেশে শহর ও গ্রামীণ নাগরিকদের সাথে স্থানীয় সরকারের যোগাযোগ ব্রিটিশ শাসনামল থেকেই প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। নাগরিকতার বিকাশে স্থানীয় সরকার গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে আসছে। নিচে তা আলোচনা করা হলো।

১) **নাগরিক সেবা প্রদানে স্থানীয় সরকার :** সকল শ্রেণির মানুষ তাদের নানা প্রয়োজনে স্থানীয় সরকার দপ্তরে যোগাযোগ করে। যেমন- শিক্ষার্থীদের পিতার আয়ের সনদপত্র সত্যায়িতকরণে এবং জন্মনিবন্ধনের সার্টিফিকেট তোলার প্রয়োজনে ইউনিয়ন পরিষদ অফিসে যেতে হয়। ইউনিয়ন পরিষদ, পৌরসভা নাগরিকদেরকে নির্দিষ্ট সময়সীমার মধ্যে সেবা প্রদান নিশ্চিত করার বিবরণ প্রকাশ করে, যা 'নাগরিক সনদ' নামে পরিচিত।

নাগরিক সেবা সহজলভ্য করার জন্য স্থানীয় পর্যায়ে বর্তমান ই-গভার্নেন্স চালুর উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে। এর ফলে ঘরে বসে মানুষ বিভিন্ন বিষয়ে প্রয়োজনীয় তথ্য দ্রুত গতিতে লাভ করতে পারবে।

স্থানীয় সরকারের ক্ষেত্রে নতুন এই সংযোজন এক যুগান্তকারী ঘটনা। এ ব্যবস্থা নাগরিক অধিকার অর্জনে পূর্বের চেয়ে বেশি সহায়ক হবে।

২. **স্থানীয় শাসনে জনগণের অংশগ্রহণ :** গ্রামে স্থানীয় সরকারের ভূমিকা গ্রামের মানুষদেরকে সরকারের সাথে সংযুক্ত করে। ইউনিয়ন পরিষদ গ্রামীণ বিবাদ সমাধানে সক্রিয় ভূমিকা রাখে।

৩. **বিবাদ নিষ্পত্তি :** যেকোনো বিবাদ নিষ্পত্তির জন্য ইউনিয়ন পরিষদ আয়োজিত সালিশ বা অনানুষ্ঠানিক নিষ্পত্তিরব্যবস্থা বেশ গুরুত্বপূর্ণ। এ ক্ষেত্রে সরকার প্রতিষ্ঠিত গ্রাম আদালত গ্রামীণ জনগণের বিবাদ নিষ্পত্তিতে আরও কার্যকর ভূমিকা রাখতে সক্ষম হবে বলে আশা করা যায়। এর ফলে গ্রামের গরিব মানুষ শহরে এসে বিচারের জন্য হয়রানির শিকার হওয়া থেকে রক্ষা পাবে।

কেস ১ : ধনিয়া ইউনিয়নের ৪ নং ওয়ার্ডের আবুল কালাম ও তার ভাতিজা জমিসংক্রান্ত বিবাদে জড়িয়ে পড়ে এবং এ ঝগড়া কয়েক বছর ধরে চলতে থাকে। ইউনিয়ন পরিষদের নেতৃত্বে সালিশের মাধ্যমে এ সমস্যা সমাধান করা হয়। যদি আবুল কালাম এ মামলা নিয়ে জেলা পর্যায়ে যেত, তাহলে তার অনেক অর্থ ও সময় নষ্ট হতো। এ অপচয়ের হাত থেকে আবুল কালাম রক্ষা পেল।

জোড়ায় কাজ : আবুল কালামের জমি সংক্রান্ত বিবাদটি মীমাংসায় তার স্থানীয় সরকারের ভূমিকা ব্যাখ্যা কর।

৪. নারীর ক্ষমতায়ন

বাংলাদেশের মোট জনসংখ্যার অর্ধেক হলো নারী। সমাজের অর্ধেক অংশকে অধিকারবঞ্চিত রেখে কোনো সমাজ উন্নতি লাভ করতে পারে না। তাই বর্তমানে সারা বিশ্ব নারীর ক্ষমতায়নকে অগ্রাধিকার দিচ্ছে। পরিবার, সমাজ ও জাতীয় ক্ষেত্রে নারীর অংশগ্রহণ, মতামত প্রকাশ ও সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষমতাই নারীর ক্ষমতায়ন। নারীর ক্ষমতায়নের লক্ষ্যে অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক, সামাজিক, সাংস্কৃতিক সকল ক্ষেত্রে নারী-পুরুষের অধিকারের সমতা বজায় রাখতে হবে। এর গুরুত্ব উপলব্ধি করে ১৯৪৮ সালে জাতিসংঘ মানবাধিকারের সর্বজনীন ঘোষণাপত্র প্রকাশ করে এবং নারী উন্নয়নে কিছু পদক্ষেপ গ্রহণ করে। ১৯৫১ সালে আন্তর্জাতিক শ্রম সংস্থা (ILO) কর্তৃক একই ধরনের কাজের জন্য নারী ও পুরুষ শ্রমিকের জন্য একই বেতন দান এবং ১৯৫২ সালে নারীর রাজনৈতিক অধিকারের কথা ঘোষণা করে। যার ফলে নির্বাচনে নারী ভোট দান ও প্রতিদ্বন্দ্বিতা করতে পারে। ১৯৬০ সালে নারীদের কর্ম সংস্থান ও পেশার ক্ষেত্রে বৈষম্য বিলোপ সনদ প্রদান করা হয় যা ১৯৭৯ সালের ডিসেম্বর মাসে জাতিসংঘের সাধারণ পরিষদে গৃহীত হয়। বাংলাদেশসহ মোট ১৩২টি দেশ বর্তমানে এ সনদ সমর্থন করেছে।

স্থানীয় সরকারে নারীর অংশগ্রহণ আগের যেকোনো সময়ের তুলনায় বৃদ্ধি পেয়েছে। নারীরা ইউনিয়ন পরিষদ থেকে শুরু করে উপজেলা পরিষদ, পৌরসভা, সিটি কর্পোরেশন সর্বত্র নির্বাচনে জয়লাভ করে নাগরিক হিসাবে স্থানীয় সরকারের সিদ্ধান্ত গ্রহণকে প্রভাবিত করতে সক্ষম হচ্ছে।

উল্লেখ্য, ১৯৯৭ সালের প্রণীত আইন অনুযায়ী বাংলাদেশে ৪৪৯৮টি ইউনিয়ন পরিষদে ১৩,৪৫২টি নারী সদস্য পদ সৃষ্টি করা হয়। এই আইনের মাধ্যমে প্রতিটি ইউনিয়ন পরিষদে ৩টি করে সংরক্ষিত নারী আসনের ব্যবস্থা রাখা হয়, যারা সরাসরি জনগণের ভোটে নির্বাচিত হয়। স্থানীয় সরকারের অন্যান্য স্তরেও নারীর অংশগ্রহণের ব্যবস্থা করা হয়েছে। এর ফলে নারীর ক্ষমতায়নের পথ সুগম হয়েছে।

৫. সংখ্যালঘুর অধিকার প্রতিষ্ঠা

এখন ধর্মীয়, লিঙ্গ পার্থক্য বা জাতিগত পরিচয় নাগরিক অধিকার অর্জনে আর কোনো প্রতিবন্ধকতা নয়। পার্বত্য তিন জেলায় বিশেষ ধরনের স্থানীয় সরকারব্যবস্থা প্রতিষ্ঠার মধ্য দিয়ে ঐ অঞ্চলে বসবাসকারী ১৩টি ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীর নাগরিক অধিকার প্রতিষ্ঠার পথ সুগম করা হয়েছে।

এর ফলে ঐ অঞ্চলের ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীর শিক্ষা-দীক্ষা এবং অন্যান্য সামাজিক, সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ডের উন্নয়নের মধ্য দিয়ে তারা বাংলাদেশের নাগরিক হিসাবে যোগ্য মর্যাদা অর্জন করতে পারছে।
সংবিধানের পঞ্চদশ সংশোধনীতে (জুলাই ২০১১) পাহাড়ি জনগোষ্ঠীর স্বতন্ত্র পরিচয়কে স্বীকৃতি দিয়ে তাদের নাগরিক অধিকারের মর্যাদা আরও শক্তিশালী করা হয়েছে।

গনতন্ত্রিক মনোভাব এবং নেতৃত্বের বিকাশ

জাতীয় পর্যায়ে যেমন নাগরিকরা ভোটাধিকার ভোগ করে থাকে, তেমনি স্থানীয় পর্যায়েও নাগরিকরা এই অধিকার ভোগ করে। স্থানীয় সরকার নির্বাচনে জনগণের ভোট প্রদানের হার জাতীয় নির্বাচনের চেয়েও বেশি। এই নির্বাচনে ভোট দিয়ে মানুষ তাদের স্থানীয় সরকার প্রতিনিধি নির্বাচন করে। জাতীয়ভাবে নির্বাচিত জনপ্রতিনিধিদের থেকে স্থানীয় পর্যায়ে নির্বাচিত প্রতিনিধির পার্থক্য হচ্ছে তাদেরকে মানুষ বেশি কাছে পায়। কারণ তারা স্থানীয় জনগণের কাছাকাছি থাকে। ফলে স্থানীয় নাগরিকরা তাদের জবাবদিহি করতে বাধ্য করতে পারে। বিশেষ করে ইউনিয়ন পরিষদের ক্ষেত্রে এটি অধিকতর সত্য। স্থানীয় পর্যায়ে এই ভোটাধিকার চর্চা নাগরিকদের গণতান্ত্রিক মনোভাবাপন্ন করে। এর ফলে স্থানীয় নেতৃত্বের বিকাশ ঘটে যা পরবর্তীতে জাতীয় নেতৃত্বে ও অবদান রাখে।

অনুশীলনী

বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

১. বাংলাদেশে মোট ইউনিয়ন পরিষদের সংখ্যা কত ?

ক) ১১৮ খ) ৪৬০

গ) ৪৮৩ ঘ) ৪৫৫০

২. ডাস্টবিন নির্মাণ পৌরসভার কোন ধরনের কাজ ?

ক) উন্নয়নমূলক খ) জনস্বাস্থ্যমূলক

গ) শান্তিপূর্ণ পরিবেশ রক্ষা সংক্রান্ত ঘ) সৌন্দর্য রক্ষা সংক্রান্ত

৩. নাগরিক সেবা প্রদানের জন্য স্থানীয় সরকার

i. আয়ের সনদপত্র সত্যায়িত করে

ii. জন্ম নিবন্ধন সনদ প্রদান করে

iii. নাগরিক সনদ প্রদান করে

নিচের কোনটি সঠিক ?

ক) i ও ii খ) ii ও iii

গ) i ও iii ঘ) i, ii ও iii

নিচের অনুচ্ছেদটি পড়ে ৪ ও ৫ নং প্রশ্নের উত্তর দাও :

জনাব রাশেদ একটি স্থানীয় পর্যায়ের সরকারপ্রধান। তিনি পচা, বাসি ও ভেজাল খাদ্যদ্রব্য বিক্রি ও সরবরাহের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য মহানগরের হোটেল ও রেস্টুরেন্টগুলোতে অভিযান চালান এবং প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করেন।

৪। জনাব রাশেদ কোন স্থানীয় সরকারের প্রধান ?

ক) সিটি কর্পোরেশন খ) জেলা পরিষদ

গ) উপজেলা পরিষদ ঘ) পৌরসভা

৫। উক্ত সরকার গুরুত্বপূর্ণ হওয়ার কারণ হলো–

ক) রাজনৈতিক কর্মকাণ্ডে জনগণের অংশগ্রহণের সুযোগ সৃষ্টি হয়

খ) জনগণের মধ্যে নাগরিক সচেতনতা বৃদ্ধি পায়

গ) স্থানীয় পর্যায়ে নাগরিক সেবা নিশ্চিত করা হয়

ঘ) শিক্ষার হার বৃদ্ধি পায়।

সৃজনশীল প্রশ্ন

১। জনাব রমজান আলী একটি উপজেলা শহরের স্থানীয় সরকারের প্রধান। তিনি কেন্দ্রীয় সরকারের প্রতিনিধি হিসাবে জনগণের চাহিদা পূরণের জন্য ঘরবাড়ি, দোকানপাট, হাটবাজার, যানবাহন ইত্যাদি থেকে অর্থ সংগ্রহ করে মহল্লার মোড়ে মোড়ে ডাস্টবিন নির্মাণ, নর্দমা ও পুকুর পরিষ্কার করে মশার ঔষধ ছিটানোর ব্যবস্থা করেন। কয়েকটি মাতৃসদন স্থাপন করে বিনামূল্যে শিশু ও প্রসূতি মায়েদের সেবা প্রদানের ব্যবস্থা করেন।

ক. বর্তমানে বাংলাদেশে সিটি কর্পোরেশনের সংখ্যা কত?

খ. পাঠাগার স্থাপন পৌরসভার কোন ধরনের কাজ– ব্যাখ্যা কর।

গ. জনাব রমজান আলীর কাজগুলোর মূল উদ্দেশ্য কী? ব্যাখ্যা কর।

ঘ. অনুচ্ছেদে উল্লেখিত কাজগুলো কি জনাব রমজান আলীর এলাকার উন্নয়নের জন্য যথেষ্ট? তোমার মতামত দাও।

২। বেগম কামরুন নাহার জাতীয় সংসদ নির্বাচনে তার এলাকা থেকে জনগণের ভোটে নির্বাচিত হওয়ার পর প্রথমে তিনি স্থানীয় ও জাতীয় নির্বাচনে সংরক্ষিত আসন ছাড়াও অন্যান্য আসনে নারীদের প্রতিযোগিতা করার জন্য অনুপ্রাণিত করেন। পরে তিনি একটি নারী শিক্ষা কেন্দ্র প্রতিষ্ঠা করেন। সেখানে নারীদের সেলাই শিক্ষা, বাঁশ ও বেতের কাজ, হাঁস-মুরগি পালন ও কম্পিউটার প্রশিক্ষণদানের ব্যবস্থা করেন। তিনি শিক্ষিত মেয়েদেরকে সরকারি বেসরকারি চাকরিসহ যেকোনো পেশায় অংশগ্রহণে উদ্বুদ্ধ করেন।

ক. ১৯৯৭ সালে প্রণীত আইনে ইউনিয়ন পরিষদে কতটি নারী সদস্যপদ সৃষ্টি করা হয়েছে?

খ. নারীর ক্ষমতায়ন বলতে কী বোঝায়? ব্যাখ্যা কর।

গ. বেগম কামরুন নাহারের প্রথম কাজটি নারীর কোন ধরনের ক্ষমতায়নকে নির্দেশ করছে? ব্যাখ্যা কর।

ঘ. 'নারী শিক্ষা কেন্দ্রে গৃহীত পদক্ষেপসমূহ নারীদের স্বাবলম্বী করে তুলবে।" –সপক্ষে যুক্তি দাও।